***Pratidhwani the Echo***
*A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science*
***ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)***
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
*Volume-VI, Issue-II, October 2017, Page No. 10-16*
*Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India*
*Website: http://www.thecho.in*

# বিবেকী কণ্ঠস্বরে স্বামীজীর নারীশিক্ষা

**মুনমুন দত্ত**
*সহকারী অধ্যাপিকা, দর্শন বিভাগ, হাজী এ কে খান কলেজ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারতবর্ষ*

***Abstract***

*"Swamiji harmonized the East and the West,*
*religion and science, past and present. And that is why he is great. Our country men*
*have gained unprecedented self-respect, self-reliance and self-assertion from his teachings." -*
*Netaji Subhas Chandra Bose.*

*Swami Vivekananda (1863-1902), defines education as to achieve fullness of perfection already present in a man. The aim of education is to manifest in our lives the perfection, which is the very nature of our inner self. In this paper we analyse the Vivekananda's views on women education, an endeavour has been made to focus on the basic theme of his philosophy. To Vivekananda, education was not only collection of information, but it meant arousing the people to an awareness of their own worth, dignity and responsibility, His objectives of education is man-making, life giving and character-building and making them the source of all the strength and sustenance of society, creating a society which will provide a healthy milieu for the development of character and personality of all its children. He says a nation's greatness is measured by the greatness of its citizens. But the greatness of citizens is impossible without the development of women. He considered men and women as two wings of a bird and it is not possible for a bird to fly on only one wing. So, according to him, there is no chance for welfare of the world unless the condition of women is improved. He wanted women to have full freedom to understand their own problems and to propose solutions for their own betterment, and set their destiny by themselves. Men must not interfere in women's problem. Men's only task should be to arrange for them proper education to make them aware of what is wrong and what is right. He believed that women could top and use their capabilities, if they were properly educated.*

স্বামী বিবেকানন্দের জীবনদর্শন এং তাঁর জাগ্রত বিবেক থেকে উৎসারিত সামাজিক ধ্যান ধারণার উপর ভিত্তি করে তার শিক্ষাচিন্তার উন্মেষ ঘটেছে। বিবেকানন্দের জীবনদর্শন প্রধানত মানবকেন্দ্রিক। তিনি মানুষের সকল সমস্যাকে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করে তার সমাধানের চেষ্টা করেছেন। ধনী-দরিদ্র, নিরক্ষর-সাক্ষর, নারী -পুরুষ, উচ্চ-নীচ, অত্যাচারী-পীড়িত প্রভৃতি সকল মানুষ তার কাছে দৈবসত্তা স্বরূপ। তিনি সকল প্রকার মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করলে ও তার ব্যবহারে মানুষের প্রতি উর্দ্ধদৃষ্টির কখনো পতন ঘটেনি। তাঁর জীবনের মূল লক্ষ্য ছিল পীড়িত, বঞ্চিত, উপেক্ষিত মানুষ গুলিকে নতুন করে বাঁচার আশা যোগানো। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এই সকল মানুষগুলির অন্তরের সুপ্ত প্রবণতাকে অনুকুল পরিবেশের প্রবণতা গুলিকে বিকশিত করতে। সেজন্য স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, "শিক্ষা হচ্ছে, মানুষের ভিতরে যে পূর্ণতা প্রথম হতেই বর্তমান তারই প্রকাশ।"[১] অর্থাৎ

মানুষের সহজাত চারিত্রিক প্রবণতাগুলি, যেগুলি পূর্ব হতেই তার মধ্যে বর্তমান সেগুলি যথাযথ অনুকুল পরিবেশের মধ্যে বিকশিত করাই হল শিক্ষা। মানব জীবন কতকগুলি বংশানুক্রমিক প্রবণতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে এবং পরবর্তীকালে সেগুলি যথার্থ পরিবেশের মাধ্যমে ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করে। মানুষের অন্তরে জ্ঞানের সুপ্ত প্রবণতা না থাকত তাহলে শত প্রচেষ্টাতেও জ্ঞানের উন্মেষ ঘটানো যেত না। অন্তঃসার শূন্য হলে বর্হিজগতের কোন প্রকার জ্ঞানকে অন্তরে প্রবেশ করানো সম্ভব নয়। কারণ শূন্য থেকে কোন কিছু সৃষ্টি হতে পারে না।এই প্রসঙ্গে পাশ্চাত্য বুদ্ধিবাদী দার্শনিক রেনে ডেকার্ট বলেন, 'exnihilo nihil fit' অর্থাৎ শূন্য থেকে কোন কিছু উৎপন্ন হয় না। যে কোন কার্য উৎপত্তির পূর্বে তার কারণের মধ্যে নিহিত থাকে, অনুকুল পরিস্থিতে তা কার্য রূপে প্রতিভাত হয়। কার্য যদি উৎপত্তির পূর্বে তার উপাদান কারণের মধ্যে নিহিত না থাকত তাহলে কার্যের উৎপত্তি সম্ভব হত না। এ প্রসঙ্গে ডেকার্ট বলেন, "the common truth "from nothing comes" is identical with it. for if we allow that there is something in the effect which did not exist in cause, we must grant also that this something has been creating by nothing."[2]

স্বামী বিবেকানন্দও শিক্ষা সম্বন্ধে অনুরূপ মত প্রকাশ করেছেন। তার মতে জ্ঞান মানুষের অন্তরে জন্মলগ্ন থেকেই বর্তমান। অন্তরে এই জ্ঞানের প্রকাশের অন্তরায় হিসাবে থাকে কিছু আবরণ। এই আবরণগুলি অপসারিত হলেই মানুষ প্রকৃত শিক্ষালাভ করতে সমর্থ হবে। এই আবরণগুলি অপসারণের পরিবেশ প্রত্যেক মানুষের ভিন্ন ভিন্ন তাই তার পরিবেশের উপর। ভিত্তি করে মানুষের জ্ঞানের সীমাও বিভিন্ন। কিন্তু প্রত্যেক ব্যাক্তি যদি নিজের ইচ্ছা শক্তির সাহায্যে অন্তর্নির্হিত শক্তিকে জাগরিত করতে পারে তাহলে প্রকৃত জ্ঞান লাভের মধ্য দিয়ে আত্মোপলব্ধি ঘটবে। জ্ঞানের খনি হল নিজের অন্তরের আত্মা। সেই আত্মাকে উপলব্ধি করতে পারলে জ্ঞানের খনিটি আবিষ্কৃত হবে এই জ্ঞানের খনিটি আবিষ্কারের জন্য স্বামী বিবেকানন্দ কতকগুলি উপায়ের সন্ধান দিয়েছেন। যেগুলি যথাযথ ভাবে অনুসরণ করলে প্রকৃত শিক্ষালাভ সম্ভব হবে।

**প্রথমত, চিত্তসংযম ও একাগ্রতাঃ** জ্ঞান লাভের ক্ষেত্রে প্রথম আবশ্যিক বিষয় হল ইন্দ্রিয় সংযম। ইন্দ্রিয়গুলির মধ্যে বিশেষত অন্তর ইন্দ্রিয় বা মনকে সংযত রাখা আবশ্যক।মন সংযত থাকলে সৎ কে গ্রহণ করার এবং মন্দকে বর্জন করার শিক্ষা লাভ করা যায়। মনকে সংযত করার প্রধান উপায় হল কোন একটি বিষয়ের প্রতি মনসংযোগ করা, তারজন্য আবশ্যক একাগ্রতা। একাগ্রতা কাজের সমাপ্তির নিশ্চয়তাকে বৃদ্ধি করে। একসাথে একাধিক বিষয়ে ইন্দ্রিয় আকর্ষিত হলে কোন কাজই সঠিকভাবে করা যায় না এবং কাজের সময়সীমাও অনেক বেড়ে যায়। মনকে সংযত করার প্রদান উপায় হল কোন একটি বিষয়ের প্রতি মনসংযোগ করা, তার জন্য আবশ্যক একাগ্রতা। কিন্তু একটি বিষয়ের প্রতি মনসংযোগ করলে কাজটি ভালভাবে সঠিক সময়ে সম্পন্ন করা যাবে। স্বামী বিবেকানন্দের মতে, জ্ঞানের লাভের জন্য আবশ্যক মনের শক্তিকে একমুখী করা। কোন বস্তু সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করতে হলে বাহ্য জগতের একটি বস্তুকে মনসংযোগ করতে হয় এবং অন্তরে তাকে উপলব্ধি করার জন্য মনকে আত্মার অভিমুখী হতে হয়। জ্ঞান তখনই যর্থাথ ও সার্থক হবে, যখন তা আত্মস্থ হবে। মনের একাগ্রতা শক্তি ছাড়া জ্ঞান লাভ সম্ভব নয়। এ প্রসঙ্গে স্বামীজী বলেন, "প্রকৃতির দ্বারদেশে আঘাত করিতে জানিলে- কিভাবে আঘাত করিতে হয়, তাহা জানা থাকিলে বিশ্বপ্রকৃতি স্বীয় রহস্য উদঘাটিত করিয়া দিবার জন্য প্রস্তুত। সেই আঘাতের শক্তি ও তীব্রতা আসে একাগ্রতা হইতে। মানুষ্যমনের শক্তির কোন সীমা নেই, উহা যতই একাগ্র হয় ততই উহার শক্তি একটি বিষয়ের উপর কেন্দ্রীভূত হয় এবং ইহাই রহস্য।"[৩]

**দ্বিতীয়ত, অনুশীলনঃ** জ্ঞান লাভের অপর একটি প্রয়োজনীয় বিষয় হল অনুশীলন। কোনো বিষয়ের যথার্থ জ্ঞান অর্জনের জন্য বিষয়টিকে একাগ্রতার সাথে বারংবার অভ্যাস বা অনুশীলন করতে হয়। তাহলে বিষয়টি ধীরে ধীরে আত্মস্থ করা সহজ হয়। শিশু যখন প্রথম শিক্ষা লাভ করতে শুরু করে তখন প্রথমটি একটি অক্ষরের উপর নজর রাখে। অক্ষরটি চিনতে এবং সেটকে আত্মস্থ করে তা দিয়ে একটি শব্দ গঠন করার জন্য তাকে বারবার অক্ষরটি অনুশীলন করতে হয়। বেশ কিছুদিন পর অক্ষরটিকে সে চিনতে শেখে ও সেটি দিয়ে কি কি শব্দ গঠন করা যেতে

পারে সে সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে। কোন বিষয়ের প্রতি বারবার অনুশীলনের মধ্য দিয়ে বিষয়টির প্রতি একাগ্র হওয়ার শক্তিও লাভ করে। এ প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ পতঞ্জল যোগসূত্রের শ্লোক উত্থাপন করে বলেন, "তস্য প্রশান্তবাহিতা সংস্কারাৎ- অভ্যাসের দ্বারা ইহার স্থিরতা হয়। দিনের পর দিন অভ্যাস করিলে মনঃসযমের এ নিরন্তর চেষ্টাপ্রবাহ স্থির হইয়া যায় এবং মনঃ সর্বদা একাগ্র হইবার শক্তি লাভ করে।"[৪]

**তৃতীয়ত, আত্মপ্রত্যয়ঃ** শিক্ষালাভের জন্য আত্মবিশ্বাসী হওয়া আবশ্যক। কারণ প্রকৃত জ্ঞান আমাদের অন্তরেই আছে, ধীরে ধীরে তা প্রকাশ পায়। শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে কাউকে অনুকরণ বা অনুসরণ করা উচিত নয়। স্বামী বিবেকানন্দের মতে, নারী-পুরুষ সকলের মন ও ধারণাশক্তি একরকম নয় তাই অন্যের আদর্শ দিয়ে নিজ জীবনের বিচার করা সঠিক নয়। প্রত্যেক ব্যক্তির পরিবেশ ও পরিস্থিতি এক নয়। এই পরিবেশ ও পরিস্থিতি অন্তরের সুপ্ত জ্ঞানের প্রকাশ ঘটায়। তাই প্রত্যেক ব্যাক্তির জ্ঞানকে বিকশিত করার পরিবেশ ও পরিস্থিতি পৃথক হয় বলে তাদের জ্ঞানের পরিধীও ভিন্ন ভিন্ন। এ প্রসঙ্গে স্বামীজী বলেন, "তোমাদের ভিতরে যাহা আছে নিজ শক্তি বলে তাহা প্রকাশ কর, কিন্তু অনুকরণ করিও না; অথচ অপরের যাহা ভাল তাহা গ্রহণ কর। আমাদিগকে অপরের নিকট শিখিতে হইবে। বীজ মাটিতে পুঁতিলে উহা মৃত্তিকা, বায়ু ও জল হইতে রস সংগ্রহ করে বটে কিন্তু বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া প্রকাণ্ড মহীরুহে পরিণত হইলে কি উহা মাটি জল বা বায়ুর আকার ধারণ করে? না, তাহা করে না। বীজ মৃত্তিকাদি হইতে প্রয়োজনীয় সারাংশ গ্রহণ করিয়া নিজের প্রকৃতি- অনুযায়ী একটি বৃহৎ বৃক্ষে পরিণত হয়।"[৫]

স্বামী বিবেকানন্দের মতে, চিত্তকে সংযম ও একাগ্র করে নিজের প্রতি আত্মবিশ্বাসী রেখে কোন বিষয়কে বার বার অনুশীলন করলে সে সম্পর্কে প্রকৃত শিক্ষা অর্জন করা সহজ হবে। তিনি বলেন শিক্ষা বা জ্ঞানই আমাদের চরম লক্ষ্য; তা থেকে সুখ লাভ করতে পারি। আর জগতের সকল দুঃখের পিছনে আছে অজ্ঞানতা তাই দুঃখের হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে অন্তরের অজ্ঞানতাকে দূর করতে হবে। সুখ এবং দুঃখ উভয়ই মানুষকে সমানভাবে শিক্ষা দেয়। সুখ মানুষকে শেখায় তার কি করা উচিৎ এবং দুঃখ মানুষকে শেখায় তার কি করা উচিত নয়। এই সুখ-দুঃখ নানাবিধ অভিজ্ঞতার মধ্যদিয়েই গড়ে উঠে মানুষের চরিত্র। আর মানুষের এইরূপ চরিত্র গঠন এবং মানুষ তৈরি করাই হল স্বামীজীর শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। মানুষের চরিত্র হল তার অন্তরের প্রবণতাসমূহের সমষ্টি। তাই প্রত্যেক ব্যক্তির মনের প্রকৃতি অনুযায়ী তার চরিত্র নির্ধারিত হয়। মানুষের চরিত্রের উপর নির্ভর করে তার কার্যপদ্ধতি। সমাজের সকল প্রকার কার্যই হল মানুষের ইচ্ছার প্রকাশমাত্র। আর এই ইচ্ছা উদ্ভূত হয় মানুষের চরিত্রের মধ্য থেকে। তাই মানুষের চরিত্র যত পবিত্র হবে, ততই তার ইচ্ছা শক্তি মহৎ কাজের উদ্দেশ্যে নিযুক্ত হবে। সুতরাং সকলের কল্যাণের জন্য চাই প্রকৃত শিক্ষা, যা পবিত্র চরিত্র গঠনের মধ্যে দিয়ে মানুষ তৈরি করবে। স্বামীজী বলেন, "এই মুহূর্তে আমার 'আমি' বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা আমার অতীত জীবনের সংস্কার-সমষ্টির ফল মাত্র। ইহাকেই প্রকৃতপক্ষে 'চরিত্র' বলে। প্রত্যেক ব্যাক্তির চরিত্র এই সংস্কার সমষ্টির দ্বারা নিরুপিত হয়, অসৎ সংস্কারগুলি প্রবল হইলে চরিত্র অসৎ হয়।"[৬]

স্বামী বিবেকানন্দের মতে বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতি মানুষের চরিত্র গড়ার উপর নজর দেয় না। এই শিক্ষা পদ্ধতি মানুষ গড়তে জানে না জানে কেরানি গড়তে। স্কুল-কলেজের শিক্ষার মধ্য আছে যান্ত্রিকতা, যা নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মুখস্থ করে পাশ করা শেখায়। এই শিক্ষা মানুষকে শ্রদ্ধা করতে শিখায় না। শাস্ত্রকে বিশ্বাস করতে শিখায় না। তাই স্বামীজীর দৃষ্টিভঙ্গিতে এটি নেতিমূলক শিক্ষাঃ এই শিক্ষা মানুষের স্বামাজীর সমসাময়িক ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থা পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল। এই পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে ভারতবাসীকে মুক্ত করতে হলে মানুষ গড়ার শিক্ষা আবশ্যক। যে মানুষ মানব জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতেন, অন্যের সমস্যার সমাধানে তৎপর, সেই দেশে স্বাধীনের কাজে আত্মত্যাগ করতে সক্ষম, আর এমন মানুষ গড়ার জন্য চাই প্রকৃত শিক্ষা। স্বামী বিবেকানন্দ বলেন, "বিদ্যাশিক্ষা কাকে বলি? বই পড়া?- না। নানাবিধ জ্ঞানার্জন?- তাও নয়। যে শিক্ষা দ্বারা এই ইচ্ছা শক্তির বেগ ও স্ফূর্তির নিজের আয়ত্তাধীন ও সফলকাম হয়, তাহাই শিক্ষা। এখন বোঝ, যে শিক্ষার ফলে ইচ্ছাশক্তি ক্রমাগত পুরুষানুক্রমে বলপূর্বক নিরুদ্ধ হইয়া এক্ষনে লুপ্তপ্রায় হইয়াছে, যাহার শাসনে নূতন ভাবের কথা

দূরে থাক, পুরাতনগুলিই একে একে অন্তর্হিত হইতেছে, যহা মনুষ্যকে ধীরে ধীরে যন্ত্রের ন্যায় করিয়া ফেলিতেছে, সে কি শিক্ষা?"[৭]

পরাধীন ভারতবর্ষকে স্বাধীন করতে প্রথমে চাই প্রকৃত। সেই শিক্ষা সকলের মধ্যে আত্ম ত্যাগ জাগিয়ে তুলবে যা দেশের পক্ষে কল্যাণকর। মানুষের শিক্ষা যদি তাকে অন্যের জন্য না ভাবায় তাহলে তা প্রকৃত শিক্ষা নয়। তাৎকালীন শিক্ষা ব্যবস্থায় সবচেয়ে বড় ত্রুটি হল, এই শিক্ষা ব্যবস্থা কেবল মুষ্টিমেয় কয়েকজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সমাজের কিছু বাছাই করা শ্রেণিই এই শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পেত। শিক্ষা গ্রহণ করেও সেই মুষ্টিমেয় তথাকথিত শিক্ষিত মানুষগুলি অন্যের দুঃখ-কষ্ট দূর করার খুব একটা প্রয়াস দেখাত না, কারণ তাদের শিক্ষা ছিল শুধু পুঁথিগত প্রাণহীন শিক্ষা। তাই অন্যের সাথে নিজেদের একাত্ম করে ভাবার প্রয়াস তাদের মধ্যে লক্ষ করা যায়নি। ফলস্বরূপ সমাজের স্থবিরতার কোন পট পরিবর্তন ঘটেনি।

শিক্ষা লাভের ক্ষেত্রে যেকোন প্রকার বৈষম্যেই সমাজের উন্নতির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাস্বরূপ। তাই শিক্ষাকে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গভেদে সীমাবদ্ধ না রেখে সর্বসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। তৎকালীন সমাজে বা পরাধীন ভারতবর্ষের দুর্দশার অন্যতম কারণ ছিল শিক্ষায় লিঙ্গভেদ। অর্থাৎ শিক্ষাক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্য। সে সময় খুব অল্পসংখ্যক পুরুষ শিক্ষালাভের সময় পেলেও নারীশিক্ষা ছিল মুষ্টিমেয়। এ প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, "...তোদের দেশের মেয়েদের লেখাপড়া শেখাবার জন্য কিছু মাত্র চেষ্টা দেখা যায় না। তোরা লেখাপড়া করে মানুষ হচ্ছিস, কিন্তু যারা তাদের সুখ দুঃখের ভাগী, সকল সময়ে প্রাণ দিয়ে সেবা করে, তাদের শিক্ষা দিতে-তাদের উন্নত করতে তোরা কি করছিস?...দেশে পুরুষদের, মধ্যে তেমন শিক্ষার বিস্তার নেই, তা আবার মেয়েদের ভিতর। ... তা না হ'লে কি দেশের এমন দুর্দশা হয়? শিক্ষার বিস্তার জ্ঞানের উন্মেষ এসব না হ'লে দেশের উন্নতি কি করে হবে?... কিন্তু জানিস, সাধারণের ভিতর আর মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার ,না হলে কিছু হবার যে নেই। ভারতবর্ষের অগ্রগতির সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা হল স্ত্রীশিক্ষার অভাব। স্ত্রী ও পুরুষ উভয়কে সমান ভাবে শিক্ষা দান করতে না পারলে সমাজের উন্নতি সম্ভব নয়। নারীদের বাদ দিয়ে পুরুষ একাকী সমাজের উন্নতি সাধন করতে অক্ষম। সমাজের উন্নতি তখনই সম্ভব যখন নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকল প্রকৃত শিক্ষার আলোকে আলোকিত হবে। স্বামীজীর মতে, প্রকৃত শিক্ষা হল সেই শিক্ষা, যা মানুষের অন্তরে সুপ্ত আকারে থাকে এবং অনুকুল পরিবেশে তা পূর্ণতা লাভ করে তার অন্তরের শক্তিগুলিকে প্রকাশের সুযোগ পাবে। নারী অন্তরের শক্তিকে যদি সৎ পথে কাজে লাগানো যায়, তাহলেই দেশের দুর্দশা ঘুচবে। ধর্ম, বিজ্ঞান, শিল্প, সেলাই, রন্ধন প্রভৃতি সকল বিষয়ে নারীকে শিক্ষা দিতে হবে। শুধু সংসারের কাজ ও পূজা-অর্চনা শেখালেই হবে না, বাহ্য জগৎ সম্পর্কে তাদের সচেতন করতে হবে। বাহ্য জগৎ সম্পর্কে অবগত হলেই পরাধীন ভারতবর্ষের লাঞ্ছনা ও বঞ্চণার বিরুদ্ধে নির্ভিক চিত্তের প্রতিবাদী নারীর আবির্ভাব ঘটবে। এ প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ বলেন, "... শিক্ষা বলিতে কতকগুলি শব্দ শেখা নহে; আমাদের বৃত্তিগুলির- শিক্ষাসমূহের বিকাশকে শিক্ষা বলা যাইতে পারে; অথবা বলা যাইতে পারে শিক্ষা বলিতে ব্যাক্তিকে এমন ভাবে গঠিত করা, যাহাতে তাহার ইচ্ছা সদ্ববিষয়ে ধাবিত হয় এবং সফল হয়। এই ভাবে শিক্ষিতা হইলে ভারতের কল্যাণ সাধনে সমর্থ নির্ভিক মহিয়সী নারীর অভ্যুদয়ে হইবে। তাঁহারা সঙ্ঘমিত্রা, লীলা, অহল্যাবাঈ ও মীরাবাঈ- এর পদাঙ্ক-অনুসরণে সমর্থ হইবেন, তাঁহারা পবিত্র স্বার্থশূণ্য বীর হইবেন।"[৯]

স্বামী বিবেকানন্দ মনে করতেন, "শিক্ষিত নারীই পরাধীন ভারতবর্ষের সমস্যার সমাধানের পথ বার করতে পারবে কারণ একজন পুরুষ শিক্ষিত হলে, শিক্ষিতের সংখ্যা হয় এক। কিন্তু একজন নারী শিক্ষিত করতে পারলে, শিক্ষিতের সংখ্যা হয় পরিবারের সদস্য সংখ্যার সমান। বিশেষত ঐ পরিবারের অভ্যন্তরের সকল ভবিষ্যত প্রজন্মেই সেই শিক্ষার সুফল ভোগ করতে পারবে। শিশুর প্রাথমিক শিক্ষার সূচনা হয় পরিবারের আভ্যন্তর তার মায়ের কাছ থেকে। সেই মা যদি শিক্ষার আলোকে আলোকিত পূর্ণ সত্ত্বা হন তাহলে সেই শিশুর শিক্ষার প্রাথমিক ভিত খুব শক্ত হয়। শক্ত ভিতের উপরেই সকল ইমারত গড়ে তোলা সম্ভব। তাই শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা যত উন্নত মানের হবে ততই সে ভবিষ্যতে মহৎ কাজে আত্মনিয়োগ করবে। তাই দেশের জন্য ভালো কর্মী পেতে হলে নারী শিক্ষার প্রসার ঘটাতে

হবে। তবেই দেশ উন্নত হবে। নারী শিক্ষার জন্য কেবল পুঁথিগত শিক্ষাই পর্যাপ্ত নয়; তারজন্য প্রয়োজন সেই শিক্ষা যা তাঁর অন্তরের শক্তিকে পূর্ণতা দান করবে। পূর্ণতা প্রাপ্ত শিক্ষিতা নারী যদি নিজেকে দেশের কাজে নিয়োজিত করে তা হলে তাঁদের দ্বারা দেশের বৃহত্তর উদ্দেশ্য সাধীত হবে। এ প্রসঙ্গে বলা যায়, "সিস্টার ক্রিস্টিন অনবদ্য ভাবে লিখেছেন, " স্বামীজীর কাছে নারী মুক্তির অর্থ সীমার বন্ধন মুক্তি-যা নারীর যথার্থ শক্তিকে উন্মোচিত করে দেবে।" ... স্বামীজী তাই বলতেন, "মানুষ্যে নিহিত যে - পূর্ণতা- তারই উন্মোচনের নাম শিক্ষা।" সেই উন্মোচন যখন নারীর ক্ষেত্রে হবে তখন সে নারী কেবল পুঁথিগত শিক্ষায় সমৃদ্ধ হবে না- সে হবে আলোকিত অস্তিত্ব। "এরকম কিছু নারী ভারতের নারী-সমস্যার সমাধান করবে। অতীতে নারী ব্যাক্তি সাধনার ক্ষেত্রে চরম ত্যাগ করেছে। এখন কি এমন এগিয়ে আসবে না যারা বৃহত্তর উদ্দেশ্যে শরীর-মন-প্রাণ উৎসর্গ করবে? ...কোন পুরুষ {নারীর জন্য} এই কাজ করতে পারবে না। কেবল নারীরাই করবে তা।" [১০]

নারীর উপর পুরুষের সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে স্বামীজী সদা আপত্তি জানিয়েছেন। তিনি মনে করেতেন শিক্ষা দেওয়া পর্যন্ত নারীকে সাহায্য করা দরকার। তারপর শিক্ষা লাভ করে নারী আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠলে তাকে তার নিজের সমস্যা সমাধান নিজেকেই করতে হবে। কারণ, স্বামীজী স্বাধীনতার উপর খুব আস্থাশীল ছিলেন। তাই শিক্ষা লাভের মাধ্যমে নারী শক্তিকে জাগরিত করে তার স্বাধীন চেতনার বিকাশ সাধন করাই ছিল তার লক্ষ্য। তিনি নারীর অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করতে সম্মত ছিলেন না। তিনি নারীকে শিক্ষিত করা পর্যন্ত অধিকার বলে মনে করতেন। শিক্ষালাভের পর সচেতন নারী নিজের সমস্যার সমাধান নিজেই করতে পারবে বলে স্বামীজী মনে করতেন। তিনি শিক্ষা ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার স্বীকার করতেন। কিন্তু তৎকালীন রক্ষণশীল পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নারী ও পুরুষের সমান কাঠামো আর বেশীদিন স্থায়ী হবে না। তাই রক্ষনশীল সমাজ পুরুষতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোকে টিকিয়ে রাখার জন্য ধর্ম, শাস্ত্র, প্রভৃতির দোহায় দিয়ে নারীকে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত রাখতে চেয়েছিল। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ নারী ও পুরুষের মধ্যে লিঙ্গ- বৈষম্য স্বীকার করেননি। নারী ও পুরুষের মধ্যে লিঙ্গ বৈষম্য সমাজ নির্মিত। উভয়ের মধ্যে জৈবিক কতকগুলি পার্থক্য থাকলেও, তার ভিত্তিতে নারীর অধিকার খর্ব করা অযৌক্তিক। স্বল্পজ্ঞানী ব্যাক্তি এই জৈবিক পার্থক্যের ভিত্তিতে নারী ও পুরুষের মধ্যে ভেদ করে থাকেন। কিন্তু প্রকৃত শিক্ষা লাভ হলে অজ্ঞানের অন্ধকার আত্মা থেকে দূর হলে মানুষ উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে যে নারী ও পুরুষের মধ্যে ভেদ করে থাকেন। কিন্তু প্রকৃত শিক্ষা লাভ হলে অজ্ঞানের অন্ধকার আত্মা থেকে দূর হলে মানুষ উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে যে নারী ও পুরুষের মধ্যে জৈবিক পার্থক্য থাকলেও উভয়ের আত্মার কোন লিঙ্গ-বৈষম্য নেই। তাই প্রকৃত শিক্ষা লাভ করতে জ্ঞানের এই অপূর্ণতা দূর হয়ে পূর্ণতার প্রকাশ হলে মানুষ উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে যে নারী ও পুরুষের মধ্যে স্বরূপত কোন ভেদ নেই। তাই শিক্ষালাভের মাধ্যমে আত্মার অজ্ঞানতা দূর করার বিষয়ে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার বিদ্যমান। এ প্রসঙ্গ স্বামীজী বলেন, "পরমব্রহ্মতত্ত্বে লিঙ্গভেদ নেই। আমারা 'আমি তুমি'র plane-a (ভূমিতে) লিঙ্গভেদটা দেখতে পাই, আবার মন যত অর্ন্তমুখ হতে থাকে, ততই এই ভেদ জ্ঞানটা চলে যায় শেষে মন যখন সমরস ব্রহ্মতত্ত্বে ডুবে যায়, তখন আর 'এ স্ত্রী, ও পুরুষ'- এই জ্ঞান একেবারেই থাকে না। ... তাই বলি মেয়ে-পুরুষের বাহ্যভেদ থাকলেও স্বরূপত কোন ভেদ নেই। অতএব পুরুষ যদি ব্রহ্মজ্ঞ হতে পারে তো মেয়েরা তা হ'তে পারবে না কেন? তাই বলছিলুম মেয়েদের মধ্যে একজনও যদি কালে ব্রহ্মজ্ঞ হন, তবে তাঁর প্রতিভায় হাজারো মেয়ে জেগে উঠবে এবং দেশের ও সমাজের মঙ্গল হবে।"[১১]

শিক্ষালাভে নারী ও পুরুষের মধ্যে সমান অধিকার স্বীকার করেন স্বামী বিবেকানন্দ, তিনি নারী পুরুষ উভয়কেই এমন ইতিবাচক শিক্ষা লাভ করেও যদি স্বাবলম্বী না হতে পারে, নিজের সমস্যার সমাধানে নারী যদি পুরুষের মুখাপেক্ষি হয় তাহলে নারীর সেই শিক্ষা অর্থহীন। নারীকে শিক্ষালাভের মধ্য দিয়ে বুদ্ধির বিকাশ যেমন ঘটাতে হবে তেমনি অন্তরের শক্তিকেও জাগরিত করতে হবে। যাতে সে নিজের সমস্যার সমাধান নিজেই করতে পারে, পুরুষের উপর নির্ভরশীলতার অবসান ঘটে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোকে টিকিয়ে রাখার জন্য রক্ষণশীল উদ্দেশ্যে নারী শিক্ষার ব্যাপারে আগ্রহী হন। তিনি নারী শিক্ষার বিস্তারের জন্য এমন কিছু শিক্ষিতা ব্রহ্মচারিণী গড়ার উপর জোর

দেন, যাঁরা মেয়েদের শিক্ষা দেওয়ার কাজে আত্মনিয়োগ করবে। ঐ শিক্ষিতা ব্রহ্মচারিণীদের তদারকীতে বালিকা বিদ্যালয়ের উপর নারী শিক্ষার ভার অর্পণ করাই শ্রেয় বলে মনে করেছিলেন স্বামীজী। তিনি এ প্রসঙ্গে বলেন, "পুরুষদের জন্য যেমন কতকগুলি centre (শিক্ষাকেন্দ্র) করতে হবে মেয়েদের শিক্ষা দিতেও সেইরূপ কতকগুলি কেন্দ্র করতে হবে। শিক্ষিতা ও সচ্চরিত্রা ব্রহ্মচারিণীরা ওই সকল কেন্দ্রে মেয়েদের শিক্ষার ভার নেবে। পুরাণ, ইতিহাস, গৃহকার্য, শিল্প, ঘরকন্নার নিয়ম ও আদর্শ চরিত্র গঠনের সহায়ক নীতিগুলি বর্তমান বিজ্ঞানের সহায়তায় শিক্ষা দিতে হবে। ছাত্রীদের ধর্ম পরায়ণ ও নীতি পরায়ণ করতে হবে।"[১২]

স্বামীজী নারী শিক্ষাকেন্দ্রের ভার নারীর উপরেই রাখতে চেয়েছিলেন বলে ব্রহ্মচারিণীদের উপরেই ওই সকল শিক্ষাকেন্দ্রের দায়িত্ব দিতে চেয়েছিলেন। ঐ শিক্ষাকেন্দ্রের ভার নারীর উপরেই রাখতে চেয়েছিলেন। ঐ শিক্ষা কেন্দ্র পুরুষসংস্রব থেকেই মুক্ত রাখাই ছিল উদ্দেশ্য। তিনি মনে করতেন নারী সকল প্রকার শিক্ষা লাভ করলে নিজের সাথে সাথে অন্যেরও সম্যসার সমাধানের পথ খুঁজে বার করতে পারবে। শিক্ষাকেন্দ্রগুলি পুরুষসংস্রব থেকে মুক্ত রাখার কারণ হল নারীদের সাবলম্বী করা। পুরুষের সহায়তা ছাড়াই নারী যখন শিক্ষা লাভ করতে ও শিক্ষা দান করতে সমর্থ হবে তখন তার আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে। আত্মবিশ্বাসী নারী পরাধীন ভারতবর্ষের সমস্যা সমূহ দূর করার কাজে নিয়োগ করতে পারলে দেশের কল্যাণ হবে। একা পুরুষের পক্ষে ভারতবর্ষরে পরাধীনতা করা সম্ভব নয়। তার জন্য আবশ্যক সক্রিয় শিক্ষিত নারীর। তাই পুরুষের অনুরূপ ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি সকল প্রকার শিক্ষা নারীরও আবশ্যক। তবেই নারী পুরুষের সাথে দেশের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করতে পারে। নারী ও পুরুষের সমপ্রচেষ্টায় দেশকে উন্নতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। স্বামীজী নারী শিক্ষার উদ্দেশ্যে বলেন, "... বিজ্ঞানাদি অন্য সব শিক্ষা, যাহাতে তাহাদের নিজেদের ও অপরের কল্যাণ হইতে পারে তাহাও শিখাইতে হইবে। ...আমাদের দেশের যথার্থ কল্যাণের জন্য ঐ রকম কতকগুলি পবিত্র জীবন ব্রহ্মচারী-ব্রহ্মচারিণী হওয়া দরকার হইয়া পড়িয়াছে। ভারতের কল্যাণ স্ত্রী-জাতির অভ্যুদয় না হইলে সম্ভব নয় । এক পক্ষে পক্ষীর উত্থান সম্ভব নহে। সেই জন্যি রাম কৃষ্ণবতারে স্ত্রী-গুরুগ্রহণ সেইজন্যই নারীভাবসাধন, সেইজন্যই মাতৃভাবপ্রচার, সেইজন্যই আমার স্ত্রী-মঠ স্থাপনে প্রথম উদ্যোগ।"[১৩]

স্ত্রী-মঠ শুধুমাত্র শিক্ষা-পরিকল্পনা সফলের উদ্দেশ্যেই গঠিত নয়, স্বামীজী আদর্শ নারী গঠনের উদ্দেশ্যে এই মঠ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেন। এই মঠের নারী শিক্ষার্থী, নারী শিক্ষিকা এবং নারীই পরিচালক। স্বামীজী এমন একটি আদর্শ মঠ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন যেখানে মেয়েদের জন্য থাকবে একটি বিদ্যালয় আর সেই বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী থেকে শিক্ষিকা সকলেই হবে নারী। মঠে শুধুমাত্র ধর্ম, সাহিত্য, বিজ্ঞানই পড়ানো হবে না তার সাথে সাথে গৃহ-কর্মের যাবতীয় বিষয়; যথা রান্না, সেলাই, প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হবে। মঠে অবিবাহিত নারী, বিধবা ব্রহ্মচারিণীদের অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের সুবন্দোবস্ত করা হবে। স্ত্রী মঠে পুরুষেরা প্রবেশ করতে পারবে না। স্বামীজীর দৃষ্টিতে আদর্শ নারী, আদর্শ জননী ছিলেন শ্রীমা অর্থাৎ সারদা দেবী। তাঁর আদের্শেই মঠের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন। শ্রীমার নামনুসারেই স্বামীজীর স্ত্রীমঠ দক্ষিণেশ্বরের শ্রী সারদা মঠ নামে পরিচিত। এই স্ত্রীমঠের মূল উদ্দেশ্য ছিল নারী শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে নারীকে তার স্বাধীকার ফিরিয়ে দেওয়া। স্বামীজীর স্ত্রীমঠের শিক্ষায়িত্রী ও প্রচারিকাদের উদ্দেশ্যে বলেন, " চরিত্রপ্রতী, ধর্মভাবাপন্না ঐরূপ প্রচারিকাদের দ্বারা দেশে যথার্থ স্ত্রী শিক্ষার বিস্তার হবে। ধর্মপরায়ণতা, ত্যাগ ও সংযম এখানকার ছাত্রীদের অলংকার হবে; আর সেবাধর্ম তাদের জীবনব্রত হবে। এইরূপ আদর্শ জীবন দেখলে কে তাদের না সম্মান করবে- কেই বা তাদের অবিশ্বাস করবে? দেশের স্ত্রীলোকদের জীবন এই ভাবে গঠিত হ'লে তবে তো দেশের সীতা সাবিত্রী গার্গীর আবার অভ্যুত্থান হবে।"১৪

স্বামী বিবেকানন্দ স্বাধীনচেতা আদর্শ নারী শক্তির অভ্যুত্থানের জন্য স্ত্রীমঠের মাধ্যমে নারী শিক্ষার প্রসারের চেষ্টা করেন। তাঁর মতে, বৈদিক সমাজে নারী ও পুরুষের শিক্ষা লাভের ক্ষেত্রে কোন বৈষম্য ছিল না। শিক্ষা লাভের ক্ষেত্রে পুরুষের সমতুল্য নারী ও সমান সুযোগের অধীকারিণী ছিল। বিশ্ববরা, ঘোষা, গার্গী, মৈত্রী প্রভৃতি বিদুষী নারীগণ বেদ পাঠে ও ব্রহ্মবিচারে অধিকারী ছিলেন। কালের প্রবাহমান ধারার মধ্যে আমরা নারীর উত্থান, পতন

সবই প্রত্যক্ষ করেছি। ইতিহাসের যে পুনরাবৃত্তি হয় তারও প্রমাণ পেয়েছি। বৈদিক সমাজে নারীর অবশ্য উত্থান পতন আমরা যেমন পরবর্তী যুগে প্রত্যক্ষ করেছি, তেমনি আবার কালের প্রবাহমান ধারার অহল্যাবাঈ, মীরাবাঈ, ঝাঁসীর রাণী লক্ষীবাঈ- এর মতো পবিত্র স্বার্থশূণ্য বীর বিদুষী নারীর অভ্যুদয় ঘটেছে। তাই এর থেকে আশা করা যায় যে, স্বামীজী প্রদর্শিত পথে নারী শিক্ষার প্রসার ঘটাতে পারলে ভবিষ্যতে ভারতবর্ষে পুনরায় বিদুষী নারীর অভ্যুদয় ঘটবে। এই প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ বলেন, "... বৈদিক যুগে, উপনিষদের যুগে দেখতে পাবি-মৈত্রেয়ী গার্গী প্রভৃতি প্রাতঃ-স্মরণীয়া মেয়েরা ব্রহ্মবিচারে ঋষিস্থানীয় হয়ে রয়েছেন। হাজার বেদাজ্ঞ ব্রাহ্মণের সভায় গার্গী সগর্বে যাজ্ঞ্যবল্ক্যকে ব্রহ্মবিচারে আহবান করেছিলেন। এ- সব আদর্শস্থানীয় মেয়েদের যখন আধ্যাত্মজ্ঞানের আধিকার ছিল তখন, মেয়েদের সেই অধিকার এখনই বা থাকবে না কেন? একবার যা ঘটেছে , তা আবার অবশ্য ঘটতে পারে। History repeats itself ….(ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয়)।"[১৫]

**তথ্যসূত্রঃ**

১. স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয় কলকাতা, ১৩৬৯, পৃ. ৪০০
২. Rene Descartes, HR, II. 34-35, in Kenneth C. Claeterbaugh, Descartes's Causal Likeness Principle, The philosophical Review, Vol.89, No.3, 1980 (Jul.). pp. 395.
৩. স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, প্রথম খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয় কলকাতা, ১৪১৮, পৃ. ১৬৯-১৭০
৪. তদেব, পৃ. ২৯৪
৫. স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, পঞ্চম খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয় কলকাতা, ১৩৬৯, পৃ. ২৮৪
৬. স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, প্রথম খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয় কলকাতা, ১৪১৮, পৃ. ৬০
৭. স্বামী বিবেকানন্দ, পত্রাবলী, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ১৪২০, পৃ. ৭৫৮
৮. স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয় কলকাতা, ১৩১৯, পৃ. ৩৩-৩৪
৯. তদেব, পৃ. ৩৪
১০. শঙ্করীপ্রসাদ বসু, বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, তৃতীয় খণ্ড, মণ্ডল বুক হাউস, কলকাতা, ২০০৮, পৃ. ২৭৬
১১. স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, নবম খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয় কলকাতা, ১৩১৯, পৃ. ২০৪
১২. তদেব, পৃ. ৩৪
১৩. স্বামী বিবেকানন্দ, শিক্ষা প্রসঙ্গ, উদ্বোধন কার্যালয় কলকাতা, ১৩১৯, পৃ. ২০৪
১৪. স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, নবম খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয় কলকাতা, ১৩১৯, পৃ. ২০৩
১৫. তদেব, পৃ. ২০০

**গ্রন্থপঞ্জীঃ**

১. শঙ্করীপ্রসাদ বসু, বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, তৃতীয় খণ্ড, মণ্ডল বুক হাউস, কলকাতা, ২০০৮
২. স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, প্রথম খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয় কলকাতা, ১৪১৮
৩. স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, পঞ্চম খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয় কলকাতা, ১৩৬৯
৪. স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয় কলকাতা, ১৩৬৯, পৃ. ৪০০
৫. স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, নবম খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয় কলকাতা, ১৩১৯
৬. স্বামী বিবেকানন্দ, পত্রাবলী, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ১৪২০
৭. স্বামী বিবেকানন্দ, শিক্ষা প্রসঙ্গ, উদ্বোধন কার্যালয় কলকাতা, ১৩১৯
৮. Kenneth C. Claeterbaugh, Descartes's Causal Likeness Principle, The philosophical Review, Vol.89, No.3, pp. 379-402. 1980 (Jul.)